দুকূলহারা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ছেলেবেলা থেকেই অবলা আমারচোখে প্রবলা। আমার জীবনগঠনেতাঁদের কোমল হাতের দায়িত্ব যে কতটা ঠিক করে বলা শক্ত। যতদিন মনে পড়ে, একজন-না-একজন নারী আমারউপরে আধিপত্য বিস্তার করেছেন, দেখতে পাই। কবে থেকে এমন চলে আসছে বলতে পারিনা; তবে প্রথম যেদিন এ তথ্যটা আবিষ্কার করি তখন ৮/৯ বছরআন্দাজ বয়স হবে, তার চেয়ে বেশি কখনই নয়। তখন চলছে আমার এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার অধিকার। একদিন আমি হঠাৎ জানতে পারলুম যে, তাঁকেছেড়ে আমার বেঁচে থাকে অসম্ভব। তাঁরবয়স আমার তিনগুণ না হলেও দ্বিগুণ, তিনি থাকতেন আম াদের বাড়িতেই। চেহারাখানির কথা ঠিক মনে নেই, তবেনেহাত মন্দ হবে না। এখনো বেশ স্পষ্টমনে আছে যে, সে ছুটির দিনটা হিন্দুসমাজের অন্যায় অত্যাচারের কথা ভেবেইকেটে গিয়েছিল। কারণ, তাঁর সঙ্গেপরিণীত হবার এই আত্মীয়তা ছ াড়া আর যে কোনো বাধা থাকতে পারে তাআমি মোটেই ভাবি নি। তখন অলৌকিকক্ষমতায় বিশ্বাসটা অটুট ছিল; কাজেই বিধাতার কাছে অনেকপ্রার্থনা জানিয়েছিলুম, অনেক পূজা মেনেছিলুম, যাতে করে পলকের মধ্যেআমরা উভয়ে ব্রিটান বা মুসলমান হয়ে যাই। সেদিন জানতুম না, যে হিন্দুর দেবতায় আর মুসলমানের দেবতায়সতত বিরোধ; তাঁরা আর যা কন বা করতে পান সহসা ধর্ম বদলে দিতেনারাজ এবং অক্ষম। অবশ্য আমার এইপ্রথম প্রণয়ের দৌড় কয়েক ঘন্টা মাত্র, কিন্তু তার মধ্যে ব্যর্থপ্রণয়ীর সকল কষ্ট আমায় সহ্য করতে হয়েছিল, এমন কীপ্রিয়ার নিষ্ঠুর পরিহাস পর্যন্ত। কেননা যখন তাঁকে আমার আশা ভরসার কথা বলেছিলুম, তিনি হেসেলুটিয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে মার কাছেযখন সে কথা উঠল তখন বকুনি থেকে আরম্ভ করে প্রহারে আমারনির্যাতনের অন্ত হল। ইংরেজিতেএকটা প্রবাদ আছে যে, দল শু হয় বাড়িতে। সেটা কতদূর সত্য তা জানি না, কিন্তু অনুরাগ বাড়িতেই যেআরম্ভ হয় এতে আর সন্দেহনেই। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ। জানি, এ কথা শুনে অনেকে শিউরে উঠবেন, বলবেন এটাবিকৃতচেতাদের বিষয়ে সত্য হতে পারে, কিন্তু সাধ ারণের পক্ষে অলীক। তাঁদের কাছে আমার আরজি এই যে,তাঁরা যেন মনু, পরাশবের রচিত চশমা ছেড়ে স্বাভাবিক চোখে নিজ নিজজীবনের দিকে দেখেন। সুস্থদৃষ্টি চশমার সাহচর্যে ঝাপসা হয়। এ দোষটা চশমার নয়, বা চশমা-কারকের নয়,চশমা-ব্যবহারীর; যেহেতু তিনি যোগ্যতা না বিচার করেই চশমা চোখেলাগিয়েছেন।

এই পূর্বরাগের অভিনয়ের উপর যবনিকা-পতন হবারসঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে 'শতং বদ মা লিখ' বাক্যট াকতদূর মিথ্যা। লেখার একটা গুণআছে যে, সেটা লোকে সাধারণত পড়ে না, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার মোটেইবিরল নয়, বিশেষত যখন কথাটা অন্য লোকের বিষয়ে। তাই সেদিন থেকে স্ত্রীজাতিকে দূর থেকেইভালোবেসে এসেছি, মুখ ফুটে বলতে সাহস করি নি (দু-একবার ছাড়া)।

আমার প্রকৃতির কতকটা পরিচয় দিয়েছি। এখন যদি বলি যে ললিতার প্রভাবঅল্প বয়স থেকেই অনুভব করে আসছি, ত াহলে সেটা কিছু আশ্চর্য শোনাবে না।

ললিতা ছিল আমার বাল্যসখী। তার বাপ মিঃ পি.সি. চ্যাটার্জী সে কালের একজন বিখ্যাত সাহেবএবং নাম-করা ব্যারিস্ট ার ছিলেন। মিস্টার চ্যাটার্জির পুরো-নাম আজ অবধি জানলুম না। বোধহয় খাঁটি সাহেবদের নাম একপদী হবে। দেশি ললিতা তাঁর হাতে পড়ে হয়েছিলবিলেতি 'লিলি'। আমরাও তাকে এই বলেই ডাকতুম। মিঃ চ্যাটার্জিলিলিকে ইংরেজি ছঁ াচে গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। তাকে বাংলা শেখান হয় নি বটে কিন্তুইংরেজিতে তার অসাধারণ দখল ছিল। ওইভাষাতে এমন বই নেই যা সে পড়েনি, পাঠ্য, অপাঠ্য সকল রকম। নামের সার্থকতা বড় একটা দেখা যায় না। আমি একজন

শশিমুখিকে জানতুম, তাঁকেমশিমুখি বললেই ভালো হত। কিন্তু লিলিসত্যই কুমুদের মত অমল, তার মনে ছায়ার লেশম াত্র চিল না। চেহারাও লিলির মতোই অনুদ্ধত, লিলিরমতোই কোমল, লিলির মতোই বিনীত।
চক্ষে হয়তো বা সুন্দরী বলে ঠেকবে না। দেশি মতে তার একটু লম্বা কম হওয়াউচিত ছিল। মুখখানি আর একটুপুষ্টু হলে ভালো হত। ঠোঁটদুটি একটু বেশি পু, চোখ হরিণীর মতো, ভু তুলি দিয়ে আঁকা ক্ষীণরেখা নয়। কিন্তু আমার মনে হয় ভ ারতেসৌন্দর্যের বিচার হয় শুধু মুখ দেখে। দেহের গঠনের উপর লাবণ্য আর রূপ যে কতটা নির্ভর করেতা আমরা বুঝি ন া বা বুঝতে চেষ্টা করি না। কাজেই অনেক রূপসীর ঠাট কাটসদৃশ অপরের বা জালার মতন। এক কথায় বলতে গেলে দেশি কিন্তুসুন্দরীর মুখসর্বস্ব 'লিলি'র দেহে কোথাও একটু খুঁত ছিল না, একটিসরলরেখা ছিল না; সকল অবয়বই বঙ্কিম এবং পূর্ণ, কিন্তু বেশি পূর্ণ নয়। আমি তাকে অনেকবার বলেছি, 'লিলি ,তুমি সুন্দর যেহেতু চাঁদ সুন্দর, তোমাদের দুজনের মধ্যেও ওই ষোড়শ কলাটিরঅভাব'। আর তার চোখ, অমন চোখ আমি আগে কখনও দেখি নি। যখন ছায়ায় থাকত তখন যেন ধূসর,কিন্তু যদি তাতে আলোর একটি রশ্মি লাগত, অমনি সে দুটি পাটল মখমলেরমতো হয়ে উঠত, একবার Impressionist school -এরএকটি রমণীর ছবি দেখেছিলুম। তাতেমুখের অন্যান্য অংশ ক্ষীণ রেখায় ব্যক্ত করে শিল্পী চে াখ দুটিকেঅস্বাভাবিক রকমের বড় করে এঁকেছিলেন। তখন বোধ হয়েছিল ছবিটা অর্থহীন, অসুন্দর। কিন্তু লিলির মতো মেয়ের ছবি আঁকতে গেলেওই চোখের উপর সমস্ত জোর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ তার মুখের বিশেষত্ব ছিল ত ারচোখ; সত্যই যেন তার আত্মার গবাক্ষ।
লিলির সঙ্গে পরিচয় ছেলেবেলা থেকে। অল্পবয়সে আমরা দুজনে অনেক স্বামী-স্ত্রীখেলা করেছি, অনেকবার ঘরকন্না পেতেছি, মারামারি করেছি। আবার কৈশোরেসে মেয়েমানুষ বলে নাক সিঁটকেছি, তাকে ঘেন্না করেছি। ফের যৌবনের গোড়ায় তাকে বন্ধু বলে গ্রহণকরেছি। আমাদের দুজনের অনেক বৈষম্যথাকলেও মনের একটা মিল ছিল। আমরাউভয়ে ছিলুম নবীন পথের পথিক, উভয়ে ছিলুম পুরাতন-দ্রোহী। তবে আমি ছিলুম নরম, আর সে ছিল গরম। আর একটা সূত্র আমাদের দুজনকে বেঁধেরেখেছিল। সেটা হচ্ছে পাশ্চাত্যসাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ, আর বাংলা ভাষার প্রতি দাণবির াগ।
তখন বয়স ছিল অল্প, চিন্তা ছিল অনুপস্থিত। কাজেই ধার করে ভাবনাআনতে হত। কী তর্কই হত, যেন আমরা দুজন হচ্ছিজগতের হর্তা, কর্ত, বিধাতা; মানবের সুখ-দুঃখের কর্ণধার, জীবন-গঙ্গারভগীরথ। দু-ঘন্টার বিচারে আমরা যেসকল কূট প্রশ্নের মীমাংসা করে ফেলতুম, সেগুলি নিয়ে কতশতমনীষী গত পাঁচ হাজার বৎসর মাথা ঘানিয়ে আসছেন । তবে নিজের পক্ষে একটা কথা বলে রাখি। আমার অপরাধটাইকিছু লঘু ছিল, কারণ আমি বেশি আশা করতুম না। হয়তো বা জীবনের কী উদ্দেশ্য তাই নিয়ে কথা চলত। লিলির একটা বিশ্বাস ছিল যে মানুষেরবিকাশের সীমা নেই। আম ার মধ্যে এভ্রমটা ছিল না। আমি জানতুম যে মানুষএকটা পরিমাণের বেশি পূর্ণতা লাভ করে না। সেই জন্যেই সভ্যতার পতন এবং অভ্যুদয় আমরা ইতিহাসে বারেবারে দেখতে পাই। লিলি এ কথা শুনলেরেগেই আগুন হত, বলত, 'তুমি হচ্ছ ভীষণ pessimist । তাই যদি হবে তবে এই যে যুগ যুগ ধরেমানুষ প্রয়াস করে আসছে তার অর্থ কী' ? আমি উত্তর দিতুম, অর্থ? কোনই অর্থ নেই। যা আছে তাই থাকবে। সকলই একটা অন্ধ নিয়তির চাকায় পড়ে একই জায়গায় ঘুরছে। কিন্তু মানুষ আশা না হলে বাঁচতে পারেনা, তাই ভাবে সে বুঝি এগুচ্ছে'। এ কথা তার সহ্য হত না তাই আমায় জিজ্ঞাসা করত, 'তবে কিবলতে চাও তোমার জীবনে কোনও উদ্দেশ্য, কোনও আদর্শ, কোনও লক্ষ্য নেই!'আমি বলতুম, 'হ্যাঁ আছে একটা মাত্র, জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। আমার মনে হয় জীবন একখানি পারসিগালচেটের মত। গ ালচে রচয়িতার শুধুএক উদ্দেশ্য থাকা উচিত, সেটা হচ্ছে যেন রংগুলো চোখে ভালো লাগে;কিন্তু কোনও একটা বাঁধা নকশা করতে গেলেই কারপেট নষ্ট হয়ে যায়।আমি আর কোনও অপরাধ মানি না, কেবলসৌন্দর্যের বিদ্ধে যে পাপ তাকে দমন করা উচিত মনে করি।' সে আমায় pessimist বলত বটে,কিন্তু আমি তাকে optimist বলতুম, কাজেই শেষে ক ার যে জয় হত তাঠিক করে বলা কঠিন।
তবে আমরা উভয়েই সমানভাবে বিশ্বাস করতুম যে,উপস্থিত রীতির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ দুজনেই মনে করতুম আমরা শ্রেষ্ঠ, আমাদের মতো যেটাভালো সেইটাই হওয়া উচিত। সেবলত শিক্ষা ভালো তাহলেই মানুষ আপনি বদলে যাবে। আমি বলতুম শিক্ষা যে কোনটা ভালো তাএখনও আবিষ্কার হয় নি। আর আবিষ্কারহলে মানুষকে তা দেয়া

যাবে না। তাকেজোর করে যা ভালো তাই করাতে হবে।

সেদিনকারতর্কের কথা মনে পড়লে আজ হাসি পায়। কী বিষম গর্ব! কী দাণ ভ্রান্তি! তখন একদিনের তরেও মনে হয়নি আমরা যা ভাবি তা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। কিন্তু আমি বরাবর বলে এসেছি ভুল আর দেমাক যৌবনের অধিকার। তার জন্য তাকে মার্জনা করা যেতেপারে।

লিলি যে শুধু জীবনের উদ্দেশ্য বা অর্থ খুঁজত তা নয়, সেঅন্বেষণের অত্যাচার থেকে সাহিত্যও বাদ যেত না। আমি তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করতুম যে কলা অর্থেরবোঝা মাথায় করে বাঁচতে পারে না। সেই জন্যই ইংরেজি সাহিত্যের একটা যুগ অত নিষ্প্রাণ। ডাক্তার জনসনের লেখায় উদ্দেশ্য আছে বলেই অল্পায়ু, কিন্তু তাঁর কথাবার্তামানের ধার ধারত না বলেই অত উপাদেয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভাবত তার কাব্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য। তাই সেগুলি কীটস্ বা শেলিরকবিতাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। এই কারণেই অস্কার ওয়াইল্ড সুখপাঠ্য আর পিনারোঅপাঠ্য। হিউগোর লেখার মধ্যে অর্থেরবহুলতা আছে, কিন্তু তা অসুন্দর ; আর আনাতোল ফ্রাঁস নিরর্থ কিন্তু রূপের রসের সাগর। শেষে এটাও তাকে বলেছিলুম যে ভেরলেনেরসময় থেকে ফরাসি কবিতার উৎকর্ষের কারণই হচ্ছে এই, যে তাতে মানেরপ্রাচুর্য নেই। বাংলা সাহিত্যআমাদের কাছে হেয় ছিল, নচেত দেখিয়ে দিতে পারতুম যে, বৈষ্ণবকবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যতই প্রশংসনীয় হোক না কেন, কাব্যের দিকদিয়ে তা টেকে না। আর উনবিংশশতাব্দীর লেখকেরা মানেটা একটু কম করে যদি রূপটার দিকে লক্ষটাএকটু বেশি রাখতেন, তাহলে তাঁদের এত শীঘ্র পাততাড়ি গুটোতে হত না।

কিন্তু এ সব কথা বৃথাই বলতুম, সে মানে বা যুক্তি না হলেকলার আদর করতে পারত না।

৩

আমাদের সম্বন্ধ ছিল মৈত্রীর। কবে যে সহসা সখ্য প্রণয়েতে পরিণত হল, তা ঠিক করেবলতে পারি না। শুনেছি উত্তাপ সবদ্রব্যের মধ্যে নিহিত থাকে,প্রচ্ছন্নভাবে। আমার মনেও তেমনি আসক্তি অনেকদিন থেকেই লুকোনো ছিল। কিন্তু বাল্যকালের সেই দাণ শিক্ষাআমি ভুলতে পারি নি। এখন আর চট্করে মনের কথা বলতুম না। তার কাছেযখন থাকতুম তখন তর্ক করে, গল্প করে সময় সুখেই কেটে যেত। কিন্তু যখন তাকে ছেড়ে যেতুম, তখনইআকাঙ্ক্ষায় প্রাণ আকুল হয়ে উঠত। অনেক ভেবে ঠিক করেছিলুমযে 'লিলি' সুন্দরী; কারণ তার রূপ শস্তা, আপাতরমণীয়ছিল না। তেমনি অনেক বিনিদ্র রাত জেগেউপলব্ধি করেছিলুম তাকে কত ভালোবাসি। কিন্তু নিজেকে নিজে বাহাদুরি না দিয়ে থাকতে পারছি না, কেনকথাটি কাউকে জানতে দিই নি, এমনকী লিলিকে অবধি না। কাজেই যেদিন হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলুমযে পরস্পরের প্রতি আমরা অনুক্ত, সেদিন যে কী বিপুল হর্ষ হঠাৎঅন্তরে জেগে উঠেছিল তা যাঁরা তেমন ঘটনাচক্রে পড়েন নি বুঝতেপারবেন না।

সে আজ অনেক দিনের কথা; স্মৃতি একটু মসিন হয়ে এসেছে। তাই সেদিন লেখা ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতকরছি ঃ

" আজকের দিনটা চিরকাল আমার মনেঅঙ্কিত থাকবে। আমার কোন কুসংস্কারনেই, তবু মনে হচ্ছে কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছিলুম। মানুষের ভাগ্যে এত সুখ, এত আনন্দ থাকতেপারে তা জানতুম না। মনে হচ্ছে সকলকামনা মিটে গেছে সকল ভোগ সমাপ্ত হয়ে গেছে। আজকে যদি মরণ এসে আমাকে ডাকে, আমি তাকে বলতে পারব'চলো, আমি যেতে প্রস্তুত।'

"লিলিদের বাড়িতে আজ 'টেনিসপার্টি' ছিল। যেতে একটু দেরিহয়ে গেল। গিয়ে দেখি দুই পাকা খেলোয়াড় টেনিস খেলতে ব্যস্ত, আরদর্শকেরা তাই দেখতে তন্ময়। কেই বা আমার দিকে ফিরে চাইবে, কেই বা আমার সঙ্গে কথা কইবে। বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলুম,'মিসিবাবা কোথায়?' সেউত্তর দিলে, 'উনকা তবিয়ত আচ্ছা নহি হ্যায়, উস্ লিয়ে উন্হোনেআপনে কামরে পে হ্যায়, বাহার নেহি আয়েঙ্গে।' আমি লিলির খোঁজে গেলুম।

"লিলি তার বুডোয়ারে একটা সোফার উপরশুয়ে বই পড়ছিল। আমি যেতেই বইখানিমুখ থেকে নামিয়ে বললে, 'বাঃ, তোমায় ফ্লানেল পরে তো বেশ দেখাচ্ছে।' আমি বললুম 'সেটাকিছু আশ্চয্যি নয়, চিরদিনই আমিসুপুষ, কিন্তু গী সাজলে তোমায় বেশ মানায়।' সে ফললে, 'না সাজা নয়, সত্যিই আজ শরীরটা ভালো নেই,তাই আর রোদ্দুরে বেই নি। তুমিকেন আমার কাছে বসে রইলে, যাও খেলগে না।'

"আমি।। খেলার কি আর জো রেখেছ, যে দুটি জোঁক খাড়া করেছ, অন্য লোোকে টেনিস কোর্টে প্রবেশ করে সাধ্য কি ! আর আমার খেলার বহর তো জানোই। এত লোকের সামনে বাঁদর সাজতে প্রস্তুত নই। তোমার কাছেই বরং বসি । কী পড়ছ?

"লিলি।। শেলি। শেলি যে কত বড় সমাজ-সংস্কারক তা আমি আগে ভালো করেজানতুম না।

"আমি।। যেখানে শেলি সমাজ-সংস্কারক হতে গেছে সেখানেই বিপদ ঘটিয়েছে। সেই জন্যই শেলি কখনও কীটসেরবিদগ্ধতার অংশী হতে পারে নি।

"লিলি বই খানি হতে থেকে নামিয়ে উঠে বসল। আমি চেয়ার ছেড়ে গিয়ে তার পাশেস্থান অধিকার করলুম। কিন্তুআগের ব্যবধানই ছিল ভলো, কাছে যেতেই কী একটা অজানা সংকোচ আমাদেরপেয়ে বসল। আর মুখ দিয়ে কথাবেরোয় না। তার বিষয় বলতে পারিনা, তবে আমার নিজের মনে হচ্ছিল যেন আমার বুকটা বর্ষার মেঘের মতোবিদ্যুতে ভার; কখন যে হঠাৎচিকমিক করে উঠবে তা জানা নেই; কোনও এক অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা আমায় যেন গিলতে আসছিল। অনেক সময় আলাপ করতে করতে এমনি একএকটা আচমকা অসহ্য বিরাম এসে পড়ে, যা শেষ করতে আমরা অশেষ চেষ্টা করি কিন্তু মুখ ফোটে না। সাধারণত সেই নীরবতার মূলে থাকে কথারঅভাব, আজকের এটা কিন্তু তেমন নয়, এর উৎপত্তি যেন কথার প্রাচুর্যথেকেই । আমার বোধ হচ্ছিল যেন এরপর যা কথা হবে সে অনেকদিনের জমা কথা।

"এমনি অবকাশকেই আমি বহুদিন থেকে ভয় করেআসছিলুম। যা ভয় করেছিলুম আজ তাইহল।

"আমি বইটা নিয়ে পাতা উল্টোতেলাগলুম। দুজনেই নির্বাক। দু-একবার হাতে হাত ঠেকা, দু-এক বারচোখে চোখ পড়ল আর অমনি আমার ঘাড়ে একটা কী ভূত চাপল, আমার লজ্জাকেটে গেল, প্রতিহত হবারভয় কেটে গেল, আমি বলে উঠলুম,'আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি শেলি একটা কথা বলে গেছেন, যেটানিরন্তর সত্য, 'What are all these kissing worth, if thou kissnot me.' "লিলির গালে এক নিমেষের জন্য স্নায়ুরসমস্ত রক্ত ছুটে এল, চোখে একটা কিসের দীপ্তি জ্বলে উঠল

মুহূর্তেইআবার মিলিয়ে গেল। এক সেকেণ্ড কাটল,দু-সেকেণ্ড কাটল; আমার কাছে সেটা যেন একটা যুগ, চুপ করে থাকতেআর পারছিলুম না। কী একটা বলতেযাচ্ছি, এমন সময় সে হঠাৎ আমায় নিজের দিকে টেনে নিলে; ও হাতে যেনআগুন ছুটছে মনে হল, যেন গাল পুড়ে গেল, তারপর এক পলের জন্য তারঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করলে। আমার মুখ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্বলছিল। শিরায় শিরায় রক্ত যেন ফেটে বেতে চাচ্ছিল। তার অসাড় দেহ বাহুর মধ্যে তুলে নিলুম। তারপর সেই চুমোর বৃষ্টি আর থামে না। সে স্পন্দহীন,শ্লথ; কেবল চোখের মধ্যেএকটা ব্যাকুলতার চিহ্ দেখতে পেলুম, যেন আমায় বলছে, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, আর সইতে পারি নে।' তাকে সোফার উপর শুইয়ে দিয়ে আমিমেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলুম।

"নিশ্বাসটা একটু সহজ হলে জিজ্ঞাসা করলুম,'লিলি এর মানে কী ?'

"সে বললে,'কৈফিয়ত তো আমার দেয়নয়, আমার প্রাপ্য।'

"আমি উত্তর দিলুম, 'অনেকদিন থেকেইজানতে পেরেছি তোমায় কত ভালোবাসি, কিন্তু সাহস করি নি বলতে। আজকে সকল সংযম খসে গেছে। অঙ্কুর মাটির নীচে কেমন করে বাড়েতা জানা যায় না।একদিন হঠাৎ দেখি যে কিশলয় গজিয়ে উঠেছে ।আমারও তেমনিঠিক।'

"সরলভাবে সে বললে, 'ভালোবাসা জানানোতো মেয়ে মানুষের কাজ নয়, তাই বলতে পারি নি। আজকে তোমার কথায় লজ্জা শরমের মাথা খেয়েধরা দিয়েছি।'

"তার পরে আবার আমরা নীরব হলুম। খানিকপরে সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম।তাকে বললুম, 'আমি চললুম আমায় মাপ কোরো।আজকে আর তৃতীয়েরউপস্থিতি আমি সইতে পারব না।'

"আজকে আমার সব দেহ, মন , আত্মা বলছে,'কিসের ভয়, কিসের ভাবনা, লিলি তোকে ভালোবাসে।' "

আমার এই আবেগ দেখে যেন কেউ আমায় ঋন্দ্বব্দ্বনপ্পন্দ্বব্দ্বপ্ত আখ্যা দিয়ে না বসেন। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে তখন আমার বয়স ছিল খুব জোর ২২।আর তোড়জোড় করে প্রেম করাআমার সেই প্রথম; এর আগে স্ত্রীলোককে দূর থেকে উপাসনা করেএসেছি কিন্তু কাছে ঘেঁষতে সাহস করিনি। অন্য আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, পূর্বে আমিই ভালে

াবেসেছি,আমায় কেউ ভালোবাসে নি। আর যদিও বা কেউ আমায় প্রীতির চোখেদেখে থাকে, ব্যক্ত করে বলে নি। এখনজিজ্ঞাসা করি, এই অসীম ঊচ্ছ্বাস কি একান্তঅমার্জনীয় ?

৪

গোল বাধল কিন্তুএখন থেকেই। আবার পুরানো ডায়েরিথেকে গোটা কয়েক ছত্র তুলে দিই। এটা হচ্ছে তার পরদিনের কথা ঃ

"আজকে সকালে উঠেই প্রথম কথা মনেপড়ল যে লিলি আমায় ভালোবাসে। ছুটে তাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলুম, কিন্তুভদ্রতার খাতিরে ফিরে এলুম। ভোর ছটার সময় কার সঙ্গে দেখা করা চলেনা, এমনকী লিলির সঙ্গেও না।

"বেলা আর কাটতে চায় না। খবরের কাগজ নিয়ে বসলুম; কিন্তু কীপড়ছি কিছুই মাথায় ঢুকল না। খালিমনে আসছে লিলির মুখখানি। বই নিয়েএকটু পাতা উল্টোলুম, কিন্তু তাতেও মন বসল না। যাই হোক কোনওরকমে সাড়ে দশটা ব াজল। এইবেশ প্রশস্ত সময়। মিঃ চ্যাটার্জি এখনই কোর্টে চলে যাবেন;লিলির সঙ্গে কথা কওয়ার অনেক সময় পাব।

"হায় রে আশা ।যা ঘটল কল্পনাতেওআনতে পারি নি। এ কী? এর মানে কী ? কেন? কেন এমন হল?

"আমি তাদের বাড়িতে গেলুম। বেয়ারাকেদিয়ে লিলির কাছে খবর পাঠালুম যে তার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরক ার। বেয়ারা ফিরে এসে বললে,"মিসি বাবাকা তবিয়ত বহত খরাব হ্যায়, আপকো সাথ মুলাকাত করনেনেই সেকেঙ্গে।" আমি ভাবলুম বুঝি লিলি বুঝতে পারে নি আমিএসেছি; উজবুক বেয়ারাটা কী বলতে কী বলেছে। তাই একটা কাগজের উপর লিখে পাঠালুম,'লিলি, তোমায় না দেখে আর থাকতে পারছি না। ছ-টার সময় একবার আসতে যাচ্ছিলুম, অতি কষ্টেনিজেকে সংযত করে রেখেছি। যদি শরীরবিশেষ খারাপ না হয়ে থাকে, তো কাছে যেতে অনুমতি দাও। শপথ করছি পাঁচ মিনিটের বেশি থাকব না।

"এবারেও বেয়ারা ফিরে এসে বলল, না তিনিদেখা করতে পারবেন না। আমি আকাশথেকে পড়লুম; তার কী এত শরীর খারাপ যে এক কলম লিখে পাঠাতেপারলে না কী হয়েছে! চাকরটাকে আবার পাঠাতে যাচ্ছিলুম জিজ্ঞাসা করবারজন্য কখন তার সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে। এমন সময় দেখি মিঃ চ্যাটার্জি কোর্টে যাচ্ছেন। আমি ছুটে তাঁর দিকে গেলুম, জিজ্ঞাসাকরলুম, 'লিলির অসুখ করেছে শুনলুম, কী হয়েছে?' তিনি একবারআমার দিকে ফিরে চাইলেন, চোখদুটো ঘৃণায় ভরা, তারপর কথার কোনওজবাব না দিয়ে সটান গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আমি অবাক, চাকরটার দিকে ফিরে চাইতেই সে হাসি সংবরণকরলে। আমার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলছিল, মনে হচ্ছিল লজ্জায় মুখ বুঝি জবারমতো লাল হয়েছে; কান দিয়ে আগুন বেচ্ছিল। কোনও কথা না বলে চাকরটাকে সজোরে এক লাথি মারলুম। সেপড়ে গেল। রাগে ফুলতে ফুলতে ছুটেবাড়ি ফিরে এলুম।

"এর কারণ কি ? মিঃ চ্যাটার্জি চিরদিন আমায় যথেষ্ট স্নেহ করে এসেছেন;আজকে হঠাৎ চাকরদের সামনে আমার প্রতি কেন এ অবিচার?"

কারণ যে কী, তা বুঝতে অনেক দিন লেগেছিল। মনে আছেসেদিন রাত্রে লিলিকে একটা চিঠি লিখেছিলুম। কী লিখেছিলুম ঠিক মনে নেই, তবেতাতে যে রাগের আর দ্রোহের গরল ঢেলে দিয়েছিলুম তা আজও স্মরণে আছে।

সে চিঠির আর জবাব আসে না। এক হপ্তা কেটে গেল তবুলিলি নিত্তর। ঠিক করেছিলুম, প্রথমে আর তার সন্ধান করব না; নিজেকে যথেষ্ট অপমান করেছি, আর নয়। কিন্তু তা হল কই? আর থাকতে পারলুম না, ভাবলুম তাদেরবাড়ি যাই। কিন্তু ভয় হল এবার হয়তোঢুকতেই পাব না। তাই আত্মসম্ভ্রম পায়ে দলে, নিজেকে ধূলাতে অবনত করে,ক্ষমা ভিক্ষা করে লিলিকে পত্র লিখলুম, "আমার অপরাধেরসীমা নেই। তুমি ছাড়া অন্য কেউ হলে ক্ষমা চাইতেই সাহস করতুম না। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণ আমারনয়। মিঃ চ্যাটার্জির মুখে যে ঘৃণার চিহ্ দেখেছিলুম, সেটা আমার কল্পনাহতে পারে; কিন্তু আমার ভদ্র প্রশ্নের উত্তরে তার একেবারেমুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া উচিত হয় নি। এটা যখন ঘটল তখন আমি সম্পূর্ণআত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম, তখন যা করেছি সেটার জন্য আমায় দায়ী করা ঘোরঅবিচার হবে। তুমি আমার প্রকৃতি ভালো করেই জানে া। রাগ যে আমারমজ্জাগত নয় তা তোমায় বুঝিয়ে বলার কোন্য দরকার নেই। চিঠিতে আমারমনের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে পারব না। যদি কাছে যাবার অনুমতি দাও, তোনিজের কথা ভালো করে বুঝিয়ে তোমার মার্জনা পেতে পারব আশ ারাখি।"

অনিশ্চিতের মর্মঘাতী তাড়না থেকে এবার অব্যাহতিপেলুম। লিলি চিঠির জবাব দিলে। তারপত্রখানা ইংরেজিতে লেখা কতকটা এইরকমঃ

“প্রিয়তম,

“এই সম্বোধন আর কাউকে কখনো আগেকরি নি, করবার আশাও রাখি নি। এটা আমার অন্তরের নিষ্ফল আবেগ বলে জেনো।

“তুমি মার্জনা চেয়েছ। কিন্তু মার্জনার আগেদোষ থাকা চাই। কোন অপরাধের জন্য তোমায় ক্ষমা করব? মাপ যদি ক াউকে চাইতে হয় সে আমায়।

“সেদিন তুমি যাবার পর অমেয় আশায় ,বিপুল আনন্দে বাবাকে আমাদের প্রণয়ের কথা জানিয়েছিলাম। উঠেছিলুম স্ বর্গে, পড়লুম পাতালে। তিনি বলেছেন আমাদের মিলন ঘটতে পারে না।এর কারণ? তুমি জিজ্ঞাসা করছ? কারণ তুমি শূদ্র আর আমি ব্রাক্ষ্মণকন্যা।অনেক তর্ক করেছিলুম, অনেক অশ্রুজল ঢেলেছিলুম, কিন্তু তাঁর সংকল্প অটল ।তাঁর দেহে যতদিন একফোঁটা রক্ত আছে, ততদিন এ-বিয়ে ঘটতে দেবেন না। তোমারসঙ্গে দেখা করতে মানা, তোমায় চিঠি লিখতে ব ারণ। অনেক করে একবারলিখবার আদেশ পেয়েছি, তাই জবাব দিতে এত দেরি। যখন তুমি এ পত্র পাবে আমিকলকাতা ছেড়ে যাব। কোথায়, সে কথা জানিয়ে কোনও ফল নেই। তাই এই শেষসুখটা, এই শেষ্‌ স্পপ্তন্মান্ধন্তপ্সন্তন্ধন্দ্ববন্দ টা অ ামারস্বপ্নজীবনের অন্তিম মুহূর্ত স্থগিত রেখেছিলুম।

“পূর্বেই বলেছি দোষ সম্পূর্ণ আমার। এক নিমেষের অসংযমের পরিণাম এতশোচনীয় হবে ভাবি নি। কিন্তু অনবধানতা অপরাধ স্খালন করে না। যতদিন মনেপড়ে তোমায় প্রীতির চোখে দেখে আসছি। তুমি যখন স্নেহ করেছ তখনআশায় বিভে ার হয়েছি, যখন অবজ্ঞা করেছ তখন নীরবে অনেক কেঁদেছি। কিন্তু অন্তরের কথা প্রকাশকরতে সাহসই হয় নি, কারণ চিরদিনই মনে মনে জানতুম তোমায় কখনো লাভকরতে পারব না। অবশ্য, এমন ভাবার প্রধান কারণ যে, কল্পনাতেওঅ ানতে পারি নি, তুমি আমাকে ভালোবাসো, কিন্তু বাবার অমতের জন্য যে সম্পূর্ণঅপ্রস্তুত ছিলুম, তা বলতে পারি নি। সম াজ কে আমি খুব ভালো করেইচিনি, কিন্তু সকলেই আশা করে যে তার নিজের জন্য নিয়মের ব্যতিত্রম ঘটবে। সেযাই হে াক, সেদিন হঠাৎ তোমার মনোভাব ব্যক্ত হতে আর আত্মসংবরণ করতেপারি নি। তার পর তোমার তপ্ত চুম্বনে সকল সংশয়, সকল কুণ্ঠা, সকল সন্দেহপুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলুম জয় হবে। যাক সে কথা!

“মনে গর্ব ছিল যে আমি স্বাধীন, সমাজ-বাঁধন ছিন্নকরেছি। সে ভুলও আজ গেছে। যদি বন্ধনমুক্ত হতুম তো সবার বারণ দলে তোমারকাছে ছুটে যেতুম। কিন্তু সে সাধ্য আমার নেই। এমনকী এ কথাও বলতে পারব নাযে তোমায় যদি পেলুম না অন্য কাউকে গ্রহণ করব না। বাঙালির মেয়েরপক্ষে চিরদিন অবিবাহিত থাকা অসম্ভব। অন্তত আমার সেমনের জে ারনেই। একবার অন্যায় করেছি, মিথ্যা শপথে অপরাধ দ্বিগুণ করব না। কাজেইএখন তোমার কাছে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর অপর গতি নেই,

“হয়তো, তোমার সেদিনের ভাবক্ষণিকের, তা যদি হয় তো এ সব বলা তোমায় বৃথা। কিন্তু বলে তবুকতকটা শান্তি পাচ্ছি তাই বললুম।

“আমার চিঠি খানা অনেকটা নভেলি ধরনেরহল, হয়তো। কিন্তু জীবনের সঙ্গে পরিচয় হবার সুবিধা ঘটে নি, নভেল, ন াটকেইএতদিন মানুষ হয়েছি, তাই আমার নবেলিয়ানায় বিশেষ আশর্চ্য হবার নেই। আরএকটা কথা বলে রাখি, যদিই নভেলি ধাঁচের হয়ে থাকে, তো বলতে হবে নভেলসত্য সত্যই জীবনের চিত্র।

“যদি ক্ষমা করতে পারো, তো কোরো।”

চিঠিখানা প্রথমবার পড়ে বুঝতে পারলুম না।আর একবার পড়লুম। ত্রমে ত্রমে যখন স্পষ্ট করে বুঝলুম তখন মনে যেআগুন জ্বলে উঠেছিল তাতে জগত ধবংস হতে পারত। চিঠিখানাকে টুকরোটুকরো করে ছিঁড়ে, সেগুলোকে পায়ের তলায় ফেলে দিলুম, জুতো দিয়েধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিলুম। তবু শান্তি পাই না; ইচেছ হল ঘরেরআসবাবপত্র ভেঙে চুরমার করে দিই। এমনি উত্তজনার বশেই মানুষ খুন জখম করে। ছুটে বেলুমলিলিদের বাড়ি যাবার জন্য। আধরাস্তায় মনে পড়ল যে সে অ ার কলকাতায়নেই; আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে এলুম। তার পর এল অবসাদ। উঃ, মনে হল যেন সমস্ত আকাশ আমার কঁ াধে বোঝা হয়ে চেপে আছে। পা আরচলে না, অতি কষ্টে ফের নিজের ঘরে এসে বসে পড়লুম।

অন্ধকার হয়ে গেল; আলো জ্বালাতে উঠবার যেশক্তির আবশ্যক সেটুকুও আনমায় ত্যাগ করে গেছল। মনে হচ্ছিল যেন মনটাকে কেঁধুয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভালো করে নয়। সে যেন ছোট ছেলের শ্লেট, মোছা সত্ত্বেওতাতে কত কী রেখা, কত কী আঁাচড় বিদ্যমান, কিন্তু একটাও পড়া যায় না।চিন্তা ছিল না, কিন্তু চিন্তার সকল কষ্টই অনুভব করছিলুম।অনেক রাত্রি হল; অসুখ করেছে ভান করে শুতে গেলুম। বিছানায় শুতেই চোখজড়িয়ে এল বটে, কিন্তু ঘুম হল না।

এর পর স্মৃতিগুলো বড়ই অস্পষ্ট হয়ে গেছে।শুধু মনে আছে যে এত যাতনার মধ্যেও লিলিকে দোষ দিতে পারিনি; অ ারক্রোধে অন্ধ হলেও তার চিঠিতে সে কতটা উদারতা দেখিয়েছে আর কতদূরনির্ভয়ে সত্য কথা বলে গেছে, সে বিষয়ে অন্ধহতে পারি নি।

মিঃ চ্যাটার্জি বোধ করি আমার গুণপনা বাবাকেও জানিয়েছিলেন।কেননা এই সময় বাবার সঙ্গে যে একটা তুমুল কলহ হয় তা অল্প অল্প মনেপড়ছে। কিন্তু তার ফলাফল বেশিদূর এগুয়নি, কারণ দু-একদিন পরেইআমার ন্দ্বজ্জ্বম্সত্ত্বব্দ জ্জ্বন্দ্বস্তুম্সব্রু হল। শুনেছি অনেকদিন ভুগতে হয়েছিল।

রোগমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলুম লিলির বিয়ে হয়েগেছে। কার সঙ্গে, কতদিন আগে তা জানবার বিশেষ আগ্রহ রইল না। এবার আররাগ হল না। কেবল একটা সীমাহীন, দাণ দুঃখ আমার হৃদয় অধিকার করে বসল।ভাবলুম, এত ত াড়ার কী কারণ ছিল? দু-চার দিন সবুর করায় কী আপত্তি ছিল? এ দিকে আমায় নিয়েযখন মরণ-বাঁচন সংগ্রাম চলছিল, তখন লিলির মনে নূতন-পুরাতন প্রণয়েরদ্বন্দ্ব ঘটেছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে প্রাচীনেরই জয় হল। আর লিলির মননবীনে জিনে নিলে। বাঃ, নিয়তির পরিহাস বড় মজার।

৫

বঙ্গ-সমাজে শুধু যে মেয়ে অরক্ষণীয়া হয় তা নয়, ছেলেওএই অবস্থাপ্রাপ্ত হতে পারে। আমারও সেই দশা হয়েছিল। অনকদিন থেকেইনানা দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। একে তো অবস্থাপন্নলোকের পুত্র, তার উপর আবার যখন বি.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হযে একটালেজ গজালো তখন তো আর কথাই নেই! সংক্ষেপে বলতে গেলে বিবাহ-বাজারেআমি সর্বতোভাবে গণ্য, মান্য এবং পণ্য ছিলুম; অনেক মেয়ের বাপেরবাঞ্ছিত ধন, অনেক মেয়ের মার সুখস্বপ্ন। সে সময় সেটা বিরক্তিরকারণ হয়েছিল। কিন্তু আজকে সে কথা স্মরণে গৌরব অনুভব করি। জীবনে অন্যকোথাও গণ্যমান্য তো হতে পারি নি; কেনা ক্রীতদাসের অন্য গুণ না থাকদৈহিক বল অথবা সৌন্দর্য থাকা দরকার। কিন্তু যে লোক সকল স্থানে আদৃত ,সকল কাজে অপটু, সে যে বিয়ে করার অযোগ্য, এ কথা তো কখনও শুনি নি। আমারঅভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে যত অকর্মণ্য, সে তত বাঞ্ছনীয়। ছেলেবেলা কাঁচা বুদ্ধির তাড়নায় ভাবতুম এমন হওয়া গর্হিত,কিন্তু আজ সে ভুল গেছে। নিঃস্ব বাঙা লি-সন্তানের অনাদর সর্বত্র; তারউপর আবার যদি তার গর্ব করার, জোর করার, আদর পাবার শেষস্থানটি কেড়ে নেওয়া যায়, তা হলে কি তার প্রতি দাণ অত্যাচারকরা হয় না? তাই তো আমি বলি বাঙালির শ্রেষ্ঠ সম্পদশ্বশুরালয় চিরদিনসমভাবে বর্তমান থাক।

সে যাই হোক, পরিণয় পাশ এতদিন কোনও রকমেএড়িয়ে আসছিলুম, কিন্তু আমার মুক্তির মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসছিল।আমার দেহ, মন শিথিল হয়ে গিয়েছিল, আত্মরক্ষা করবার বা প্রতিবন্ধঘটাবার সামর্থ্য ছিল না। এর আগে বাব ার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি, অনেক বিবাদকরেছি, তাঁর রাগে ভীত হই নি, তাঁর দুঃখে বিচলিত হই নি; বিয়েকরতে কখনও রাজি হইনি। এবার সুস্থ হবার পর, আবার যখন সেইপ্রস্তাব উঠল তখন আমি বাধা দেবার জন্য দু-একবার নিষ্ফলপ্রয়াস করেছিলুম বটে, কিন্তু সাধারণত নিশ্চেষ্ট ছিলুম। আমারঔদাস্যের মধ্যে প্রতিশোধের ইচ্ছে যে ছিল না, তা নয়। বেবেছিলুম, লিলি যদিএত শীঘ্র ভুলতে পারে, আমিও তাকে ভুলতে পারব, অন্তত তাকে দেখাব যেভুলেছি। হায়, হায়, তখন বুঝি নি আগুন নিয়ে খেলে গেলে গৃহদাহেরআশঙ্কা আছে!

কিন্তু আমার দেহ যত সবল হতে লাগল, মন তত সন্দিগ্ধ হতেলাগল। ক্রমশই বুঝতে পারছিলুম কাজটা কতটা অন্যায় হচ্ছে। এখন যদি উপায়থাকত তো এ বিয়ে হতে দিতুম না;

কিন্তু সে পথ বন্ধহয়েছিল। তবে, নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষবলে মানতে পারি না। এখন্য লিলিকে শিক্ষা দেওয়ার অভিলাষ ছাড়তে পারিনি; অবমানিতের দাণ দেমাকও ভুলতে পারি নি। তা যদি পারতুম তা হলেএ বিয়েও বন্ধ করতে পারতুম। অবশ্য পিতৃদেব বিষম কুপিত হতেন, কিন্তুকার রাগকে কখনো ভয় করতে শিখি নি।

তারপর সে শুভ (ঠিক বলতে গেলে অশুভ) দিনএসে উপস্থিত হল। আরেকবারআমার ডায়েরির সাহায্য নিতে হল দেখছি ঃ

"আজকে আমায় ঘিরে আনন্দ চলছে, কিন্তু আমারমনে হাসি কোথায়! ওই যে নহবত বাজছে মনে হচ্ছে ওটা যেন আমারই কান্না। আমারএকটা আদর্শ ছিল যে মনে এক ভাব মুখে এক ভাব কখনও করব না। তাই জন্যই কিআমার ভাগ্যে চিরদিন অপলাপ করতে হবে। কখনও কোনও কিছুর কারণ খুঁজিনি, কিন্তু আজ না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারছি না, 'আমার উপর এঅভিশাপ কেন?' চিরিদিন ভেবে আসছি জগতটা মন্দ নয়, কিন্তু আজ আমার সেবিশ্বাস কোথায়! এই আলো, এই হাওয়া আজকের নব বসন্তের পুলক, মনেহচ্চে এ সকলই মায়া; যেন একটা কী বিরাট দুঃখ এই আস্তরণেঢাকা রয়েছে। এতদিন যা বুঝি নি আজ জেনেছি, জগত ষোড়শীর নয়নকোণেসূর্যাস্ত প্রতিফলিত স্বর্ণ অশ্রুর মত। দেখতে বড়ই সুন্দর, কিন্তুএকবার তলিয়ে ভাবলে তার মধ্যে যে কত ব্যথা কত নিষ্ফলতা সকলই স্পষ্টহয়ে ওঠে!"

"বিয়ে তো হয়ে গেল, কিন্তু যন্ত্রণার এই তোসবে শু। কোথায় গিয়ে শেষ হবে ভেবে পাচ্ছি না। উঃ বিয়েররাত্রি। মানুষেকয়েক ঘন্টার মধ্যে যে এত যাতনা সহ্য করতে পারে তা জানতুম না। সকলেরচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস হচ্ছে যে এত কষ্টের মধ্যেও মুখখানা সহাসরাখতে হয়েছিল।

"আমার স্ত্রী! কথাটার যথার্থ মানে বুঝতেপারছি না। তার আমার সঙ্গে কী সম্বন্ধ ? শুতে একবার মন্ত্র আউড়ে গেল আরআমরা দুজনে এক হয়ে গেলুম! এ বাঁধন আর জীবনে ছিঁড়বে না। ভার্যা! সেচিরকাল ভার হয়েই থাকবে; অন্য কোনও সম্পর্ক তার সঙ্গে সম্ভব না।

"একটা কথা কেবলই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি,'কেন এমন করলুম।' আমার ফিলসফি, এ পরীক্ষা সইতে পারলেনা। ভেবেছিলুম জীবনের কাছে কোনও দাবি দাওয়া করব না; কিন্তু যা আসে তাকে মাথা পেতে নেবার শক্তিকই? আর একটা কথা। নিজের জীবননষ্ট করার অধিকার আমার আছে; কিন্তু পরের জীবন ব্যর্থ করছিকোন নীতির জোরে? সে হয়তো অনেকআশা করেছিল!"

৬

সুদূর ব্যবধানের চশমা পরে দেখতে পাচ্ছি আমার স্ত্রীসুন্দরী ছিল। কিন্তু তখনও লিলির ছবি অস্পষ্ট হয় নি। লিলি ছিল আমার নারী বিষয়ে উপমান,কাজেই তার পাশে প্রতিভাকে রূপসী বলে বোধ হয় নি। কিন্তু সে যেআমায় লিলির চেয়ে কম ভালোবসত তা মনে হয় না, যদিও তখন সেটা উপলব্ধিকরি নি।

তখন ভাবতুম যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তার আমায়ভালোবাসা সম্ভব নয়, বিশেষত যখন আমি তাকে মোটেই প্রশ্রয় দিই নি।কিন্তু তখন জানতাম না যে বাঙালির মেয়ে স্বামী হবার আগে থেকেইস্বামী-ধারণাটার সহিত পরিচিত এবং তার প্রতি অনুরক্ত। তাইতেইচার চক্ষুর মিলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা নিজেদের প্রাণ পতিরপায় বিলিয়ে দিতে সমর্থ হয়।

এ কথা আমি তখন বুঝি নি, তাই তার প্রেমেরপ্রতিদান দিতে পারি নি বা চেষ্টা করি নি। মা আমার অল্পবয়সেই মারা গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতে অন্য স্ত্রীলোকও ছিলেন না;কাজেই তার আমি ছাড়া আর গতি ছিল না। সে যখন দেখলে যে আমাদের উভয়েরসম্পর্ক নিকট করবার জন্য আমি কোন চেষ্টা করি না, তখন লজ্জা জলাঞ্জলিদিয়ে নিজের উপরেই সেই ভার নিয়েছিল।

প্রতিভা প্রথমে ভেবেছিল নিজেকে আড়ালে রেখে সেবায় আমায় তুষ্ট করবে, দেখতুম আমার সকল প্রয়োজন পূর্বহতেই সাধিত হচ্ছে। সে নিজের হাতে আমার কাজের টেবিলটা ঝাড়ত,কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখত, খাওয়াদাওয়ার তত্ত্বাবধান করত। কিন্তুতাতে যখন আমার মন পেলে না, তখন বেশভূষাতে, কথায়বার্তায় চিত্তাকর্ষণকরতে চেষ্টা করেছিল। আমি মনে মনে হাসতুম। একটা নির্দয়তা আমায়আশ্রয় করেছিল?

একদিনের কথা এখনও বেশ মনে আছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমিএকলা আমার বসবার ঘরে বসে আছি; সহসা প্রতিভা এসে হাজির হল। আমিজানলার দিকে চেয়ে পূর্ববৎ বসেই রইলুম। তার বেশের পরিপাট্য দেকে ভারি হাসি পেয়েছিল, কষ্টেসেটাকে সংবরণ করলুম। সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল; তারপরে আস্তেআস্তে এসে আমার পাশে দাঁড়াল ! আমি যেমন নীরবতেমনই রইলুম। খানিক বাদে তার কম্পিত উষ্ণ হাত আমার স্কন্ধ স্পর্শকরলে। হঠাৎ বলেই বোধহয় আমার গা যেন উঠল শিউরে। আমি তাড়াতাড়িএকটু সরে গিয়ে তার মুখের দিকে চাইলুম। ওঃ, সে চোখের মধ্যে কী

নীরবব্যথা, কী আকুলতা, কামনা যেৱন উথলে পড়ছে। একটু ক্ষণ নিস্তব্ধথেকে প্রতিভা বললে, 'তুমি রাতদিন কী ভাবো বল দিকি? আমার সঙ্গে কথা কওয়া তো এক রকম বন্ধকরে দিয়েছ।'

আমি হেসে উত্তর দিলুম, 'তা বেশ সময় কথা কইতেএসেছ, এখন তো দেখছি কোথায় বেচছ, তাই একবার যাবার সময় আপ্যায়িতকরে যাওয়া হচ্ছে। আর দোষ হল আমার।'

সে বললে, 'কে বললে আমি বেচ্ছি?' আমি জবাবদিলাম, 'তোমার সাজ! বাড়িতে কেউ অমন বেশে থাকে না।'

তার চোখ যেন জ্বলে উঠল, আর কোনও কথা না বলে সেঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে যখন শুতে গেলুম, দেখলুম প্রতিভাঘুমিয়ে পড়েছে, তার গালে শুষ্ক অশ্রুর কৃষ্ণরেখা।

৭

চার পাঁচ বছর এমনিভাবে কেটে গেল। তার পর বাবামারা গেলেন,আমারও কলকাতার শেষ বন্ধন টুটল। এতদিন কোনও রকমে টিঁকেছিলুম। কিন্তু এখন আর একলা সংসার করতে মন সরছিল না। আমি ঠিক করলুম ভবঘুরে বেব। গোড়ায় গোড়ায় প্রতিভাকে একলা ফেলে যেতে দ্বিধা বোধ হযেছিল। কিন্তু অনেক ভেবে যাওয়াই ঠিককরলুম। মনকে প্রবোধ দিলুম এই বলে যে এমন অনাদর আর বেশিদিন পেলেপ্রতিভার হৃদয়ে যে অবশিষ্ট প্রীতিটুকু আছে তা ঘৃণায়পরিণত হবে। বিচ্ছেদের একটা গুণ হচেচ যে সে-সময় দোষগুলো ভুল হয়েযায়, কেবল গুণগুলো মনে থাকে, আরও ভাবলুম, নূতন জায়গায় গিয়ে নূতনদৃশ্য দেখে পুরানো কথা ভুলে যাব। পরে ফিরে হয়তো বেশ সুখেই তার সঙ্গেঘর করতে পারব। কিন্তু প্রতিভার যে অত আপত্তি হবে তা কখনও ভাবিনি।

সে যখন শুনলে আমি দীর্ঘকালের জন্য বিদেশ যাচ্ছি, তখনআমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, বললে, 'তা হবে না।'

আমি বললুম, 'কেন? তুমি যদি একলা থাকতে না পারো তোমার বাপের বাড়ি গিয়েথাকো গে।'

সে বললে, 'আমার তো বাপ মা নেই, কাকীর সঙ্গেবনে না, আমি সেখানে যাব না।'

আমি বললুম, 'তবে আমি সব বন্দোবস্ত করে দিয়েযাব যাতে তোমার কোনও অসুবিধা না হয়।'

সে বললে, 'যদি একান্তই যাবে তো আমায় সঙ্গেনিয়ে চলো।'

আমি উত্তর দিলাম, 'আরে, তাও কি কখনো হয়,মেয়ে মানুষ সঙ্গে থাকলে কি কখনও বেড়ানো যেতে পারে। না না অমন অবুঝ হলেচলবে কেন?'

সে বললে,'আমি অবুঝ হলুম। এখানে কী নিয়ে থাকব।যখন সন্তান চেয়েছিলুম, তুমি সে কামনা পুরাও নি; তা হলে বলতেপারতে ছেলেপিলে রয়েছে, একলা থাকতে পারবে।'

আমি বললুম, 'সে পুরানো কথা তোলার দরকারকী? তোমায় তো বলেছি তুমিছেলেপিলে ভালোবাসতেপারো, আমার বাপু ও সব পোষায় না।'

সে বললে, আমার কি তবে কোনও অধিকার নেই। আমায়যখন বিয়ে করেছ তখন ফেলতে চাইলে চলবে না।'

এবার আমি চটে গিছলুম, বললুম, আমি অতশতঅধিকার-টধিকার বুঝি না। তোমার অভাব কোনখানে আমি বুঝতে পারছি না।যাদের ছেলে হয় না তাদের যদি স্ত্রীকে না নিয়ে এক-পা নড়বার আদেশ না থাকেতা হলে তো সংসারে বাস করা চলে না। বিয়ে করেছি বলে তো আর নিজেকেবিক্রি করে দিই নি। যতদূর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে তা তোমার জন্য করেদিযেছি, কিন্তু আমি অচল হয়ে বসে থাকতে পারব না।'

সে বললে, হ্যাঁ, স্বাচ্ছন্দ্যের হানি একদিনও হয় নি;কিন্তু সুখের কথা উত্থাপন করে কী লাভ? কথায় কথা বেড়ে যায়! আমি তোমায় অচল হয়ে থাকতে বলছি না,রাগ, গোঁসা করছি না, পায়ে ধরে মিনতি করছি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো। আমিযদি এক মিনিটের জন্যও বোঝা হয়ে উঠি আমায় রাস্তায় ফেলে যেও।

আমি বললুম,' এ তো ছেলে খেলার কথা নয়। সে হতেপারে না, তুমি হেথায় থাকো, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব।' বলেইআমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

তিন-চারদিন পরেই বেরিয়ে পড়লুম। যাবার দিনছবিখানি আজও হৃদয়ে খোদা আছে। তার চাহনি যেন বুকে বিঁধতে লাগল। মনে হলকাজটা অন্যায় হচ্ছে ফিরে যাই। তারপর আবার মনে হল তার দাবির কথা। ভাবলুম, 'আমিতো তাকে আমায় বিয়ে করবার জন্য সাধ্য সাধনা করি নি, আমার উপরদাবির কী অধিকার আছে? একটুশিক্ষা হওয়া উচিত।

মেয়েমানুষের জাতকে প্রশ্রয় দিতে নেই, সর্বদা শাসনে রাখতে হয়।'

৮

তারপর সারা ভারতবর্ষটা চষে ফেললুম। কত শহর দেখলুম, কত নদী পার হলুম, কতপাহাড়ের চূড়ায় উঠলুম। কোথাও কিন্তু দু-দণ্ড স্থির হয়ে বসতেপারছিলুম না। এতদিন যে চঞ্চলতা হৃদয়ের মধ্যে দ্ধ ছিল তা আজ যেন ছাড়াপেয়ে আমায় কশাঘাত করে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। অতীতের বোঝা আমারবুক থেকে অনেকটা নেবে গিয়েছিল, কিন্তু নবীনের নেশ া এখনও কাটে নি মাস ছয়েকপ্রায় গত হল। শেষে পুরীতে এসে উপস্থিত হলুম। তখন গরমের মুখ,লোক আর ধরে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা লোকের ভিড় ছেড়ে এক দূরপ্রান্তে একলা বসেছিলুম। কয়েকদিন ধরে কলকাতায় ফেরবার ইচছামনের মধ্যে জেগেছিল। আজ হঠাৎ প্রতিভাকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলুম।ভাবছিলুম সিধা কলকাতায় যাব, না কোনারক দেখে ফিরব, এমন সময় সহসাচোখের সামনে দিয়ে কে একটি স্ত্রীলোক চলে গেল। মনে হল যেন আমার দিকেএকবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। কে ও? ও না লিলি!

আমার বুক একবার কেঁপে উঠল, তারপর যেনএকেবারে থেমে গেল। আমি ধাঁ করে উঠে তার পেছু পেছু ছুটলাম। লিলি বুঝি বুঝতে পেরেছিল আমি তাকেধাওয়া করছি, সেও তার গতির বেগ বাড়ালে। আমি ডাকলুম, 'লিলি'। তার প া আরও জোরে চলল। আবারডাকলুম, 'লিলি'। এবারে সেথেমে আমার দিকে ফিরে চাইলে। আমার নিশ্বাস তখন বেগে বইছিল, আমিকষ্টে বললুম, 'লিলি, কীসের ভয়ে আমার কাছ থেকে পালাচ্ছিলে?'সে, সেকথার উত্তর না দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে?'

'ভবঘুরে। আর তুমি?'

'শরীর ভালো নেই; ডাক্তারের উপদেশে।আজ সন্ধে হয়ে গেছে, যাই।'

'অত ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই। এত বৎসরতোমার সন্ধান করি নি। কিন্তু যখন দেখা হয়েছে আজ সহজে ছাড়ছি না। একটাকৈফিয়ত তোমার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য।'

'তুমি কি জিজ্ঞাসা করবে জানি। " কেনবিয়ে করলুম?" কিন্তু আমি তো কোনওদিন বলি নি যে কুমারী হয়েথাকব।'

'তা বলো নি বটে, কিন্তু এটাও বলো নি যে দু-মাস নাযেতে যেতে বিয়ে করবে। আমি তোমাকেও ভালো করে জানি, তোম ার বাবাকেওচিনি। তোমার অনিচছা সত্ত্বেও যে এ বিয়ে হয়েছে তা কেমন করে বিশ্বাস করব।কেন এটা জানবার অধিকার কি আমার নেই?'

'অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু কারণ আমি নিজেওজানি না। আগে ধারণা ছিল কারণ ছাড়া, অর্থ ছাড়া জগতে কোনও কিছু ঘটে না।এই নিয়ে তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। কিন্তু এখন বুঝেছি, মানে অনেকজিনিসেরই নেই।' এই বলে সে যেতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললুম,'আর একটা কথা জানতে ইচছা হয়। আমাদের আর দেখা হবে কি না জানি না,ত াই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি সুখী?'

তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরিয়ে এগল। সেরূঢ় স্বরে উত্তর করলে, 'আমায় সে প্রশ্ন করবার কারঅধিকার নেই। এমনকী তোমারও না।'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'তোমার কথা জানি না তবেআমি, তোমায় এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি নি,' কিন্তু হঠাৎ ত ারশরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল লিলি কেমন বদলেগেছে; কী তা ঠিক করতে পারছিলুম না। হঠ াৎ দেখলুম, তার সে সুন্দরগঠন নেই। তার কটিটা এখন অক্ষীণ। সে আঘাত যে বুকে কিরূপ বেজেছিলতা ব্যক্ত করে বলতে পারি না। আমারনিশ্বাস রোধ হয়ে এল। মনে হল এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন। তার পরেলিলির দিকে আবার চাইলুম। ন া, এ তো স্বপ্ন নয়, এ যে সত্য। আমারমাথা ঘুরছিল, গা, হাত, পা কাঁপছিল, কে যেন কানে কানে বলছিল প্রবঞ্চনা,প্রবঞ্চন া, জগত জুড়ে একটা বিরাট প্রবঞ্চনা চলছে। হৃদয়ের তিক্ততাচাপা দিতে পারলুম না। বিকট হাসি হেসে বললুম, 'ও বুঝেছি। আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আরদরকার নেই।'

লিলির মুখ ফ্যাকাসে হল, চোখের আগুন নিবল, সেআস্তে আস্তে চলে গেল।

৯

আবার এক মুসাফিরখানা থেকে অপর মুসাফিরখানায়ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। আম

ার কাঁধে যেন অশান্তির এক ভূতচেপেছিল। বাড়িতে চিঠি পত্র লেখা ছেড়ে দিলুম। প্রতিভার পত্রগুলোখুলেও দেখতুম না। একপল বিরাম নেই, কোনও আশ্রয় নেই। ভারতময় পর্যটনকরে বেড়াতে লাগলুম। এক বৎসর কেটে গেল।

তখন আমি আগ্রায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাজমহলে যমুনারউপর চাতালটায় বসে ছিলাম। সেদিন পূর্ণিমা, তাজমহল অমল আলোকে ধৌত।চারদিকে একটা অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে; কোথাও একটি শব্দনেই, কোথাও একটি মানুষ নেই। বসন্ত তখনও যায নি কিন্তুতার পালাপ্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফুলগুলো সব পূর্ণ প্রস্ফুটিত। আরদক্ষিণ হাওয়া যাব ার আগে কিশলয়ের সঙ্গে শেষ খেলা খেলে নিচ্ছে। চারপাশেসবুজের লহরী, আর পাতার গান সে শান্তিকে যেন আরও শান্ত করেতুলছে। আমার বোধ হল আমার মনেও তেমনি করে নূতনের তরঙ্গ উঠছে, আরএকটা বিরাট নির্বাণ বুক দখল করে নিয়েছে।

লিলির মুখ ক্ষীণতম হয়ে গেছে, আর তার জায়গায় প্রতিভার ছবি প্রোজ্জ্বলহয়ে উঠেছে। কী একটা অজানিত আনন্দে চিত্ত ভরে গেল। এমনই হৃদয়ের গতি।এখন কালো মেঘে অন্তর ভরা। ক্ষণিকের পাগল হাওয়ার স্পর্শেপরিষ্কার হয়ে নীলিমা জ াগে। ঠিক করলাম নিষ্ফল ভ্রমণ অনেক হয়েছে। পরিব্রাজকবৃত্তি ছেড়ে গৃহী হব।

অশেষ আগ্রহে তাড়াতাড়ি কলকাতার জন্য রওনা হলুম। সে রেলপথ আর ফুরোয় না।

বাড়িতে এসে পৌঁছুলুম প্রায় দেড় বছর বাদে।কোনও খবর দিই নি কারণ প্রতিভাকে অবাক করে দেবার ইচ্ছা ছিল।বা ড়িতে ঢুকেই প্রতিভা প্রতিভা বলে ডাকতে আরম্ভ করেদিলুম। কোন সাড়া নেই। অনেকক্ষণ বাদে একটা অচেনা চাকর বেরিয়ে এল।সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কে , কাকে চান?' আমি আত্ম পরিচয়দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বউমা কোথ ায়'?

সে বললে, 'জানি না, তিনি মাসখানেক আগে কোথায়গেছেন, বোধহয় বাপের বাড়ি।'

আমার কথাটা ভালো লাগল না। আমায় না জানিয়ে প্রতিভা বাপেরবাড়ি গেছে বিশ্বাস হল না। তারপর মনে পড়ল যে ত ার চিঠিগুলো না পড়েছিঁড়ে ফেলতুম। কিন্তু মন তবু প্রবোধ মানলে না, কত সন্দেহ কত সংশয়আমাকে অভিভূত করে ফেললে। আমি আমার খুড়শ্বশুরের কাছে তার করলুম।

সন্ধের পর তারের জবাব এল। 'প্রতিভা এখানেনেই। একমাস আগে তার শেষ চিঠিতে জেনেছি সে তোমার কাছে যাচ্ছে।' আমি তারটা হাতে করে গৃহকোণে বসে রইলুম। রাত্রিঘনিয়ে আসছিল। চাকর এসে বলল রাত্রে তার থাকার কথা নয়, অনুমতি দিলে সেযায়। ক্রমশ শহরের কোলাহল থামল, পথ বিজন হল। আমি অন্ধকারের মধ্যে নিঃসাড়েবসে বসে দেখছিলুম আমার জীবনের ধ্বংসাবশেষ। সন্ধ্যের আগে থেকে মেঘ করেছিল।এখন কালবোশেখির প্রথম উচ্ছ্বাস আমার শিথিল মুঠি থেকে তারখানাউড়িয়ে নিয়ে গেল। নীচে থেকে অর্গল মুক্ত দ্বার -পতনের আওয়াজ ভেসে এসেআমার একা কিত্ব স্পষ্টতর করে তুললে। তারপর আকাশ চিরে বৃষ্টিনামল; সে যেন বিধাতার তপ্ত অশ্রু!

২৯শেমাঘ(১৩৩০)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com